Downloaded from: justpaste.it/75oe8

# মাওয়ায়েযে থানভী (রাঃ) থেকে নির্বাচিত কাহিনী

==========

**আল্লাহর কেনি ক্ষুদ্রতম সৃষ্টিও অনর্থক নয়**

গোলজারে ইব্রাহীম নামক গ্রন্থে জনৈক চিকিৎসকের এক চমৎকার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। একদিন পায়খানায় বসে বসে তার মাথায় এক আজব খেয়াল চাপলো--এই পায়খানার পোকা, এতে কোন কাজে আসে, কোন উপকার ও হয় না; তবে এ সৃষ্টির রহস্য কি? এধরনের চিন্তার কিছু দিন পর তার উভয় চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। বহু চিকিৎসার পরও তার চোখের কোন উন্নতি দেখা গেল না।

ঘটনাক্রমে সে গ্রামে চক্ষু বিশেষজ্ঞ এক চিকিৎসক এলেন। অন্ধ চিকিৎসকও তার শরণাপন্ন হন। চিকিৎসক তার চোখে একপ্রকার ঔষধ লাগিয়ে দিলেন আর কয়েক দিনের মধ্যেই তার চোখ ভাল হয়ে গেল। তিনি সবকিছু ভাল ভাবেই দেখতে লাগলেন। বিস্ময়ের আতিশয্যে সে চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করলেন, এ ঔষধ তৈরীতে কি কি বস্তু ব্যবহার করা হয়েছে? চিকিৎসক বললেন, এক ঔষধ তৈরীতে পায়খানার পোকার অংশই বেশী। সতর্ক চিকিৎসক সাথে সাথে বুঝে ফেললেন যে, পায়খানার পোকা সৃষ্টি নিরর্থক মনে করার কারণেই অদৃশ্য থেকে আমাকে এই শাস্তি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এভাবে, আমাকে এর উপকারিতা বুঝিয়ে দিলেন।

**ফায়দঃ** আমরা না জানলেও কোন বস্তুই আল্লাহ তা'আলা অনর্থক সৃষ্টি করেননি। সব কিছুই যে মানুষের কোন না কোন উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে এ ঘটনা তারই একটি দালিলিক প্রমাণ নয় কি?

**হায়দ্রাবাদের এক শিক্ষকের কাহিনী**

হায়দ্রাবাদের এক পণ্ডিত আমাদের অঞ্চলে শিক্ষক হয়ে আসে। সে ছাত্রদের বই-কিতাব বুঝিয়ে দেয়ার পর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কি বুঝেছো? ছাত্ররা তাদের রীতি অনুযায়ী হাঁ সূচক মাথা নাড়ায়। কিন্তু শিক্ষক মনে করেছে যে, তারা কেউ পড়া বুঝেনি। তাই সে দ্বিতীয় বার বুঝিয়ে বলার পর জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি বুঝেছো? ছাত্ররা পুনরায় তেমনিভাবে মাথা নাড়লো। শিক্ষক ছাত্রদের মেধাহীনতার কথা ভেবে চিন্তিত হলেন এবং তৃতীয় বার আরও পরিস্কার ও ব্যাখ্যা করে বুঝাবার পর তারা বুঝেছে কিনা জিজ্ঞেস করলে ছাত্ররা পূর্বের মত মাথা নাড়লো। শিক্ষক এতে দারুন নিরাশ হয়ে এক ব্যক্তির নিকট অভিযোগ করে বললেন, এখানকার ছেলেরা দারুন মেধাহীন। তাদের মাথায় কিছুই নেই। আমি একটি পড়া তিন তিন বার বুঝিয়ে বলার পরও তারা মাথা নেড়ে বলে বুঝিনি। সে লোকটি ছিলো বুদ্ধিমান। হায়দ্রাবাদ ও এ অঞ্চলের রীতিনীতি সম্পর্কে সে ওয়াকিফহাল। জিজ্ঞেস করলো, তারা কি মুখে বলেছে যে, আমরা বুঝিনি, শিক্ষক বললো, মুখো তো বলেনি-তবে অস্বীকার বুঝায় এমনিভাবে তারা মাথা নেড়েছে। তখন তিনি তাকে বলেন, এখানের রীতি অন্য ধরনের। এখানে এমনিভাবে মাথা নেড়ে বুঝান হয় যে, তারা বুঝেছে।

**ফায়দাঃ** শরীয়তের কোন কোন বিধান পাত্র স্থান ভেদে রীতির পরিবর্তনের কারণে কখনও তার হুকুমও আংশিক পরিবর্তিত হয়ে যায়। যা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। দক্ষ লোকের কাছেই কেবল সমাধান পাওয়া যায়।

**দারাসিকো এবং আলমগীরের ক্ষমতার লড়াই**

দারাশিকো এবং আলমগীর উভয়েরই রাজক্ষমতা অর্জনের ইচ্ছা ছিলো। দারাসিকোর ইচ্ছা ছিলো প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার বাগডোর হাতে নিয়ে সম্রাট হওয়া। আলমগীরের ইচ্ছা ছিলো, রাজক্ষমতার সহায়তায় দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। কেননা আলমগীর (রঃ) একজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারে রাজক্ষমতা অর্জনের কথা চিন্তাই করা যায় না। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভে বুযুর্গদের দু'আ লাভের প্রবণতা উভয়েরই ছিলো। উভয়ে প্রায়ই কোন না কোন পীর দরবেশের কাছে যেতেন। শাহজাদা দারাসিকো সব ধরনের দরবেশের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল। আজকালের বেদয়াতীদের মত যাকে তাকে সে বুযুর্গ দরবেশ মনে করতেন।

একবার শাহজাদা দারাসিকো সংবাদ পেলেন যে, দিল্লীতে এক বুযুর্গ ব্যক্তি এসেছেন। বাস্তবেও তিনি একজন খাটি বুযুর্গ ছিলেন। দারাসিকো তার খেদমতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বুযুর্গ ব্যক্তি শাহজাদার সম্মানার্থে নিজ আসন ছেড়ে দিয়ে শাহজাদাকে সেখানে বসতে বলেন। বুযুর্গের আসনে বসা তার দ্বারা সম্ভব নয় বলে বিনয়ের সাথে সে এ কথা প্রকাশ করে। বুযুর্গ পুনরায় তাকে বসতে বলেন। কিন্তু দারাসিকো বিনয়াবনত ভাবে আশ্চান্বিত হয়ে বললেন, একি আমার দ্বারা সম্ভব যে, বুযুর্গদের স্থানে পা রাখবো! এবার বুযুর্গ বলেন, বেশ ভাল। অতপর বুযুর্গ নিজের আসনে বসে পড়লেন। বিদায়ের বেলা বুযুর্গকে তার সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য দু'আ করতে বল্লে তিনি বলেন, শাহজাদা! আমিতো তোমাকে সিংহাসন দিচ্ছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় তুমি তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এ মারাত্মক ভুলের কারণে দারাসিকো দারুন মর্মাহত হলো।

এখন এ চিন্তা তাকে অস্থির ও ব্যাকুল করে তুললো, যেন কোন ভাবেই আলমগীর এ ঘটনার কথা জানতে না পারে। সে যেন এই বুযুর্গের খবর জানতে না পারে। ঘটনাক্রমে এই বুযুর্গের সংবাদ পেয়ে আলমগীরও তার খেদমতে উপস্থিত হলেন। বুযুর্গ তার জন্যও নিজ আসন ছেড়ে দিয়ে তাকে ওখানে বসার জন্য অনুরোধ করলেন। প্রথমবার সেও ওজর আপত্তি করলো, কিন্তু যখন দ্বিতীয়বার বসতে বললেন, তখন (আদেশ পালন শিষ্টাচারের উর্ধ্বে) বলে তার নির্দেশ পালনার্থে তার আসনে গিয়ে বসলেন। বিদায়ের সময় তিনিও সিংহাসন ও রাজ মুকুটের জন্য তার দোয়া প্রার্থনা করলেন। তখন বুযুর্গ বললেন, সিংহাসন তো তুমি পেয়েই গেছে। এটাই তো সিংহাসন। তবে রাজ মুকুট আমার আয়ত্বের বাইরে। আলমগীর জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! তা কার নিকট। বুযুর্গ বললেন, তা তোমার এক চাকুরীজীবির আয়ত্বে, যে তোমাকে অজু করায়, সে যদি স্বহস্তে তোমার মাথায় পাগড়ী বা টুপি পড়িয়ে দেয় তবে রাজমুকুটও তুমি পেয়ে যাবে।

আলমগীর চিন্তা করলেন এতো কোন কঠিন ব্যাপার নয়। সে তো আমারই চাকুরীজীবি। কোন বুযুর্গই তার চাকুরীচুক্তির অত্যাবশ্যকীয় বিষয় পালনে অনিহাও জানাতে পারে না। তার দায়িত্বই হলো আমাকে অজু করাবে। কাপড় পরাবে। আমি তাকে বলে অবশ্যই সে আমার মাথায় টুপি কিংবা পাগড়ী পরিয়ে দিবে।

আলমগীর প্রাসাদে ফিরে আসলেন এবং কিছুক্ষণ পড়েই সেই চাকুরীজীবীকে ডেকে পাঠালেন। সে অজুর পানি নিয়ে উপস্থিত হলো। আলমগীর পাগড়ী খুলে অজু করলো। এবং বললো, পাগড়ীটি আমার মাথায় পড়িয়ে দাও। সে খুব বিনয়ের সাথে বললো, শাহজাদা আমার কি এমন দুঃসাহস আছে যে, আপনার মাথায় হাত দিব। আলমগীর বললেন, না আমার মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দিতেই হবে। অগত্যা তিনি তার মাথায় পাগড়ী

পরিয়ে দিলেন এবং দিল্লীর সেই দরবেশের নাম নিয়ে গালমন্দ করলেন। তার পর দিল্লী থেকে তিনি গায়েব হয়ে গেলেন।

দেখ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো আলমগীরের চাকুরী করলে ও কিন্তু তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিকতায় কামিল ব্যক্তি। স্বয়ং আলমগীর রাজ মুকুট অর্জনের ব্যাপারে তার অনুগ্রহভাজন ছিলেন তাই কোন কবি বলেছেন, "আল্লাহ্ প্রেমে বিভোর ব্যক্তিদের তুচ্ছ মনে করো না। কেননা তারা সিংহাসন ও মুকুটহীন বাদশাহ্।"

**ফায়দাঃ** আদেশ পালন করা হলো সবচেয়ে বড় আদব, শিষ্টাচার। দেখুন, আলমগীর আদেশ পালনের কারণে রাজত্ব লাভ করলেন। আর আদব বা শিষ্টাচারের মূল কথা হলো প্রিয়জন ও সম্মানীত ব্যক্তিকে আত্মপ্রশান্তি দেয়। কথাটা সব সময় মনে রাখা দরকার।

**বিবি তমীজনের কাহিনীঃ**

বিবি তমজিন নাম্নী এক মহিলা ছিল পাপি ও ভীষণ দুরাচারিনী। কোন বুযুর্গ ব্যক্তি একবার তাকে অজু করিয়ে নামায পড়ান এবং বিদায় লগ্নে তিনি মহিলাকে নছিহত করে যান, সে যেন নিয়মিত নামায আদায়ে গাফিলতি না করে। দীর্ঘ দিন পর সেই বুযুর্গ আবার উক্ত অঞ্চলে আসেন এবং বিবি তমীজনকে জিজ্ঞেস করেন, পাবন্দির সাথে নিয়মিত নামায পড়ছে তো? উত্তরে বল্লো, হাঁ, পড়ি। আবার জিজ্ঞেস করলো, অজুও করো তো? উত্তর মহিলা অত্যন্ত প্রফুলের সাথে বললো, আপনি যে অজু করিয়ে দিয়েছিলেন তা দ্বারাই নিয়মিত নামায পড়ছি।

মাওলানা রফী উদ্দীন সাহেবও এমনি একটি ঘটনা বলেছেন। এক পানি বহনকারীকে তিনি অজু করিয়ে দেন এবং এ ধারণা করে তিনি তাকে কোন বিশেষ তাকীদও দিলেন না যে, সেতো সর্বদা পানি নিয়েই থাকে, সুতরাং অজু করা তার জন্য কোন মুসকিল কিছু নয়। কিছু দিন পর দেখলেন, সেই পানি বহনকারী অজু ছাড়াই এসে নামাযে দাড়িয়ে গেছে। বিষয়টা লক্ষ করে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এটা করলে কি? অযু ছাড়াই নামায পড়ছো! সে বললো, "হুজুর আপনিই তো আমাকে অযু করিয়ে দিয়েছিলেন। সে অযু দিয়েই নামায চালাচ্ছি।"

**ফায়দাঃ** তার অজু এমনই পাকা ও মজবুত যে তা স্ত্রী সহবাস, পায়খানা, প্রস্রাবের দ্বারাও ভংগ হয়না। তার ধারণা ছিলো, অযু ভংগ হওয়ার মত কোন জিনিস নয়। ঠিক আজকালকার এক শ্রেণীর ভণ্ডপীরদের মতো তাদের বুযুর্গীও এত মযবুত যে, শত পাপেও তাদের বুযুর্গী নষ্ট হয় না। নমায না পড়লে ও তাদের বুযুর্গীর একটুকু ক্ষতি হয় না। একেই বলে ভণ্ডামী।

**এক পীরের ঘটনা**

কথিত আছে, জনৈক মুরীদ তার বিবাহের আকদ খানীর জন্য নিজের পীর সাহেবকে না ডেকে অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে বিবাহ কার্য সম্পাদন করে। মুরীদের এ কাণ্ড দেখে মুরীদ ব্যবসায়ী পীর সাহেব ভাবলেন, সকলে যদি তাকে এভাবে এড়িয়ে চলে তবে তো তার বেচে থাকাই মুশকিল হবে। অনুষ্ঠানে যোগদানের দাওয়াত না পেলে টাকা আসবে কোত্থেকে? টাকা আমদানীর পথ বন্ধ হয়ে গেলে তো মহা বিপদ! বেঁচে থাকাই দায়।

একথা চিন্তা করে তিনি তৎক্ষণাৎ মুরীদের বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন এবং বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমার বিবাহ কে পড়িয়েছে? আমাকে ডাকা হলো না কেন? দেখ, এখনই আমি তোমার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে

দিচ্ছি এই বলে তিনি আশ্ শামসি অদদুহা-সূরাটি সুর করে পড়তে লাগলেন। সূরার শেষের দিকে এসে মুরীদকে বললেন, আর মাত্র এক-দু'আয়াত বাকী আছে। সে দু'আয়াত পড়ে ফেললেই তোমার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। এ কথা শুনে মুরীদ দিশেহারা হয়ে পড়ল, কোন উপায়ন্তর না দেখে পীর সাহেবকে থামিয়ে পকেট থেকে পাঁচটি টাকা বের করে তার হাতে গুজে দিলো। এবার পীর সাহেব কিছুটা শান্ত হলেন। এরপর সে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বল্লো, হুজুর এবারের জন্য ক্ষমা করে দিন।

**ফায়দাঃ** হযরত থানভী (রাহঃ) এই ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেছিলেন, কিছু ব্যক্তির তাকওয়া পরহেওভাধা অবস্থা হলো এরূপ যে, তারা যতই তাকওয়া পরিপন্থী কাজ করুক তাতে যেন তাদের তাকওয়া সামান্যতম হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। তারপর তিনি মৃদু হেসে বলেন, মজার কথা হলো, পীরের মনে কষ্ট দিলেও নাকি মুরীদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়।" এক ধরনের লোক আছে যারা পীর সেজে ব্যবসা করে, এসব কাজ ওই সব ভন্ড পীরেরাই করে। একটু লক্ষ্য করলে আপনার চোখেও তাদের এসব ভণ্ডামী স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।

**যেমন কুকুর তেমন মুগুর**

এক মুসলিম বাদশাহর শাসনামলে এক নাস্তিক কোরআনকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য বললো, এই গ্রন্থ কখনো আল্লাহর কালাম হতে পারে না। কারণ এতে কিছু আয়াত বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ একটি কথা বার বার বলা আল্লাহর জন্য শোভা পায় না, এই কথা শাহী দরবার পর্যন্ত পৌছলো। বাদশাহের নির্দেশে ওই নাস্তিককে দরবারে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু সে তার মতে অটল। বাদশাহর প্রশ্নের জবাবে সে সেই একই উত্তর দেয় এবং খুব দৃঢ়তার সাথে বলে, একই কথা বার বার বলা আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয়। বাদশাহ ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান, তিনি মাথা নেড়ে জল্লাদকে হুকুম দিয়ে বল্লেন, "আচ্ছা আল্লাহর জন্য কোন কাজ বা কথা যদি একাধিক বার বলা অশোভনীয় হয় তাহলে একটি হাত, একটিপা, একটি কান কেটে ফেলো। দুই চোখের একটি উপড়ে ফেলো। কেননা সবগুলো তো আল্লাহর সৃষ্টি নয়।

আল্লাহর জন্য নাকি একাধিক বার করার বিষয়টা শোভনীয় নয়। তাই জোড়া অঙ্গগুলোর একটি কেটে ফেলো। কেননা, আল্লাহর সৃষ্টিতে যখন একই বস্তু ও বিষয় একাধিক নয় এবং অশোভনীয় তাই এগুলো রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। আজ আমাদের কারো কারো ধর্মীয় অবস্থাও এমন হয়েছে। নামায ভালো লাগে নামায খুব, পাবন্দীর সাথে আদায় করে। অথচ যাকাত, হজ্জ ভালো লাগে না বলে সে সম্পর্কে দারুন উদাসীন। লেন দেনে সুদ-ঘুষ বিচারের ধার ধারে না। আবার কেউ অন্যগুলো বাদ দিয়ে রোযাকে খুব গুরুত্বের সাথে আদায় করে আর বাকী সব আমল থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। কেউ কেউ তো হজ্জ করে নিজেকে জান্নাতীই দাবী করে বসে অথচ জুলুম, অত্যাচার করেই চলছে, আমানতের খেয়ানত করছে, ব্যভিচার থেকেও বেঁচে নেই। লোকেরা অনেক হাজীদের এজন্যই পাজী বলে থাকে।

ইদানিং (১৩৪২ হিজরী) বাজারে এক নতুন ধরনের তাফসীর এসেছে যার ভূমিকায় লিখা আছে এ তাফসীর গ্রন্থটি লিখতে অনেক আলেম অংশ গ্রহণ করেছে। যদিও সবাই কামেল ছিলেন না কিন্তু সকলে এক সাথে অংশগ্রহণের কারণে তারা কামেল হয়ে গেছে। এ বক্তব্যটির একটি চমৎকার মিছাল-আছে। তা হলো এক কৃপণ অপরিণামদর্শী ব্যক্তি নদীর তীরে গিয়ে গাড়োয়ানকে বললো, তীরে ও নদীর মাঝখানে কি পরিমাণ পানি আছে মেপে আমাকে বলো। গড়োয়ান মেপে দিলে আরোহী গর্দভ ব্যক্তিটি তার গড় কষে দেখলো যে গড় পড়তা পানি কোমড় পর্যন্ত হয় তাই সে গাড়োয়ানকে পানিতে গাড়ি নামিয়ে দিতে নির্দেশ দিলো। কিন্তু গাড়িটি যখন মাঝ নদীতে পৌছলো তখন ডুবতে শুরু করলো। কিন্তু গর্দভ আবার হিসাব করতে লাগলো। হিসাব কি আর বাস্তব মুতাবিক হয়।

**আল্লাহর পক্ষ থেকে ধার্মিকদের সাহায্য হয়**

এক ধার্মিক ব্যক্তি শুক্রবার দুপুরে তার ক্ষেতে পানি দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে জুমআর আযান হলে সে চিন্তা করলো, যদি ক্ষেতে পানির ব্যবস্থা করি তবে জুমআর নামায পাবো না, আর যদি নামাযে যাই তবে পানির ব্যবস্থা করতে পারছি না। এ ধরনের চিন্তার পর অবশেষে জুমআয় শরীক হওয়াই প্রাধান্য দিলেন এবং পানি দেয়া বন্ধ করে নামাযে চলে গেলেন। নামায পড়ে এসে দেখেন যে তার ক্ষেত পানিতে টইটুম্বুর। কাণ্ড দেখে দারুন বিস্মিত হলে পার্শ্ববর্তী কৃষক বলতে লাগলো, ভাই, আজ এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। আমরা নিজেদের ক্ষেতে পানি দিচ্ছিলাম অথচ বালতির পানি সব তোর ক্ষেতে গিয়েই পরতো। সত্যই ধার্মিকদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য সর্বদা হইতেই থাকে। তবে কখনো তা দৃশ্যমান হয়ে যায়। আর তাদের সময়েও আল্লাহ তায়ালা অনেক বরকত দান করেন।

**আল্লাহর গজব থেকে সর্বদা দূরে থাকা দরকার**

আমার মামা মুন্সি শওকত আলী সহেব যখন সরকারী মাদ্রাসায় পড়তেন তখন একবার এক ইনেসপেক্টর মাদ্রাসা পরিদর্শন করতে আসে ও সে ছাত্রদেরকে এমন প্রশ্ন করলো যা তার জন্যও শোভনীয় নয়, আর নিচের ক্লাসের ছোট ছোট ছাত্রদের পক্ষে তার জবাব দেয়াতো সম্ভবই নয়। সে ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলো, বলতো আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ছাত্রওরা এ ধরনের প্রশ্নের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। তাই তারা এ প্রশ্ন শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। ইনেসপেক্টরের বুদ্ধিহীন কাজে মামা অধৈর্য হয়ে তাকে বললেন, “মিয়া সাহেব, এ প্রশ্ন আমাকে করুন, আমিই উত্তর দিচ্ছি।” ইনেসপেক্টর তার পদমর্যাদার অহংকারে অসন্তোষের সুরে বললেন “আচ্ছা তবে আপনিই জওয়াব দিন।” মামা বললেন, “আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ হলো যে, আপনি প্রথমে ছিলেন না এখন অস্তিত্ব লাভ করেছেন। আর প্রত্যেক নশ্বরের জন্যই কোন কার্যকারণ থাকে তাই আল্লাহই আপনার অস্তিত্বের কার্যকারণ।” ইনেসপেক্টর বললেন, “আমাকে তো আমার পিতামাতা সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেননি।” তখন মামা তাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন, “আপনার পিতাকে কে সৃষ্টি করেছে?” সে বললো, “তাদের জন্মদাতা পিতামাতা।” মামা বললেন, “আপনার কথামতে জন্মদাতাদের ধারাবাহকিতা এভাবে চলতে থাকবে অথবা তা এক পর্যায়ে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে। যদি এধারা বিরতিহীন ভাবে চলতে থাকে তবে তা অন্তহীনতার পর্যায়ে পড়ে যা কোন সৃষ্টির ব্যাপারে প্রয়োজন। আর যদি অন্তহীনতা হয় তবে তা এক পর্যায়ে আল্লাহ পর্যন্ত গিয়ে দাড়ায়। অর্থাৎ আল্লাহ এসবের সৃষ্টিকর্তা বলে প্রমাণিত হয়।” ইনেসপেক্টর সাহেব এর কোন জবাব না দিয়ে বললো, “আপনি তো তর্ক শাস্ত্রে দারুন পারদর্শী। আমিতো তর্ক শাস্ত্রে পারদর্শী না, সাদাসিধে কথাই আমরা জানি। তাই যদি আপনার আল্লাহ থাকে তবে তার নিকট দোয়া করুন যেন আমার চক্ষু ভাল করে দেন।”

উল্লেখ্য যে, ইনেসপেক্টরের এক চক্ষু ছিলো দৃষ্টি শক্তিহীন। তার কথার উত্তরে মামা বললেন, “আচ্ছা আমি এখনই চোখ বন্ধ করে আপনার এ সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছি। তারপর তিনি ভনিতা করে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রেখে চোখ খুলে ইনেসপেক্টরকে বললেন, “আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু আল্লাহ বলেছেন যে, আমি তাকে দুটি চক্ষু দান করেছিলাম কিন্তু সে আমার নেয়ামতের অস্বীকার করেছে এবং বলেছে যে তাকে তার পিতা-মাতা সৃষ্টি করেছে। তাই আমি তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তার একটি চক্ষুর আলো ছিনিয়ে নিয়েছি। এখন আপনি তাকে বলে দিন, সে যেন তার পিতার থেকেই সে চোখের দৃষ্টি শক্তি আদায় করে নেয় যারা তাকে সৃষ্টি করেছে।”

মামার এ কথা শুনে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো কিন্তু বলার মতো তার কিছুই ছিলো না। ফলে সে মাদ্রাসার ব্যাপারে খারাপ রিপোর্ট করে, একজন বুযুর্গের সাথে এরূপ অন্যায় আচরণ করে এ বেয়াদবীর কয়েকদিন পরেই তার শরীরে মারাত্মক বেদনা শুরু হয় এবং সে মৃত্যুবরণ করে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র গজব বান্দার জন্য খুবই মারাত্মক তাই সর্বদা তা থেকে পানাহ্ চাওয়া দরকার। আল্লাহ্‌র গজব, আবার দু'ধরণের হয়। কখনো দৃশ্যত ভাবেই আল্লাহ্‌র গজব দেখা দেয়। আবার কখনো, আল্লাহ্‌র গজব শীথিল আকারে অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে নাফরমানী করার প্রচুর সুযোগ দান করেন। আর সে সুযোগ পেয়ে নাফরমানীতে আকণ্ঠ ডুবে যায়। দ্বিতীয় প্রকার গজব খুবই মারাত্মক ও ভয়াবহ্। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে তার গজব থেকে রক্ষা করুন।

**হযরত উমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সত্যই গৌরবের বিষয়**

এক শিয়া এক সুন্নীকে তীরস্কার করে বললো, "উমরের ইসলাম প্রচার ও প্রসারের অবদানে তোমরা খুব গর্ব বোধ করো। আর তা তার কামেল মুসলমান হওয়ার প্রমাণ হিসাবে পেশ করো। অথচ তার এই কাজগুলো দ্বারা তো তার মুসলমান হওয়া প্রমাণিত হয়না। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপাচারী ব্যক্তি দ্বারা এধর্মের সহায়তা করবেন।" শিয়ার একথার উত্তরে সুন্নী মুসলমান ব্যক্তিটি বললো, "আপনার কথার দ্বারা তো এটা প্রমাণিত হলো যে, পাপাচারী ব্যক্তি যে ধর্মের খিদমত করেছেন তা হলো ইসলাম ধর্ম ও সত্য ধর্ম। তাই তোমার কথা অনুযায়ী উমর (রাঃ) যে ধর্মের খিদমত করেছেন অবশ্যই তা ছিলো সত্য ধর্ম, ইসলাম ধর্ম। এখন চিন্তা করো হযরত উমর (রাঃ) যে ধর্মের খিদমত করেছেন তা শিয়াদের ধর্ম না সুন্নীদের ধর্ম অবশ্যই তুমি বলবে যে তা সুন্নীদের ধর্ম। এদ্বারা সুন্নীদের ধর্মই হক ও সত্য বলে প্রমাণিত হয়। আর উমরের (রাঃ) ধর্মও সুন্নীদের ধর্ম ছিলো তাই তার মুসলমান হওয়া ও কামেলুল ঈমান হওয়া প্রমাণিত।" একথা শুনে শিয়া হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

**ভালোবাসার মজা**

এক অন্ধ ওস্তাদ কোন বাড়ীর ছেলেদেরকে পড়াতো। ছেলের মা ওস্তাদের সন্তুষ্টির জন্য ছেলের হাতে মাঝে মধ্যে সুস্বাদু খাবার পাক করে অন্ধ ওস্তাদের জন্য পাঠাতেন। কখনো কখনো ছালামও পাঠাতেন। কিন্তু অন্ধ শিক্ষক তার অর্থ করে ভিন্নভাবে। সে ভাবলো যে, ছাত্রের মা তাকে ভীষণ ভালবাসে। তাই ধীরে ধীরে তার মাঝে ভালবাসা দানা বাধতে থাকে। একদিন সে ছেলের মাধ্যমে তার মায়ের নিকট প্রেমের কথা জানিয়ে মোলাকাতের ইচ্ছা প্রকাশ করে। মহিলাটি পূণ্যবতী ছিলো। অন্ধের এ ব্যবহারে সে খুব মর্মাহত হয়ে এ কথা স্বামীর নিকট খুলে বলে। তারপর উভয়ে মিলে সিদ্ধান্ত করলো যে, এ অন্ধকে তার প্রেমের মজা ভালোভাবেই দেয়া দরকার। তারা এক চমৎকার ফন্দি আঁটলো এবং ছেলের মাধ্যমে অন্ধ শিক্ষককে আসতে বললো।

অন্ধ ওস্তাদ সময় মতো গিয়ে পৌছলে অন্দর মহলে তার থাকার ব্যবস্থা করা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজায় আওয়াজ পড়লো দরজা খোলার জন্য। অন্ধ শিক্ষক গৃহ স্বামীর আওয়াজ শুনে ঘাবড়ে গেল। কিন্তু মহিলা অভয় দিয়ে বললো, কোন চিন্তা নেই আমি এর ব্যবস্থা করছি। তুমি শাড়ী পরে বসে জাতা পিষতে থাকো। অন্ধ তাই করলো। মহিলা গিয়ে দরজা খুলে দিলে স্বামী ঘরে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলো, ইনি কে? স্ত্রী বললো, আমাদের বাদী, আটার প্রয়োজন ছিলো তাই অসময়ে ডেকে পাঠিয়েছি। কিছু আটা পিষে দিচ্ছে। তারপর স্বামী বসে রইলো। আর বাদী বেশী অন্ধ ওস্তাদ অসহায়ভাবে বসে বসে আটা পিষছে। কিন্তু কততক্ষণ আর পিষবে। ক্লান্ত হয়ে তার হাত অবশ হয়ে আসছিলো। আটা পেষায় তার মন্থরতা দেখে স্বামী কুদ্ধ হয়ে বললো, "কি পোড়া কপালী আটা পেষার সময় ঘুম আসছে।" একথা বলেই জুতা দিয়ে আচ্ছা মতো কয়েকটি দিয়ে তারপর আবার গিয়ে বসলো।

অন্ধ ওস্তাদ ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আবার আটা পিষতে শুরু করে। পাছে যদি তার প্রেমের কথা ফাঁস হয়ে যায় তবে আর রক্ষে নেই। তাই চুপ করে রইলো এবং সে খুব দ্রুত আটা পিষতে লাগলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পিষার পর আবার হাত দুর্বল কর্ম অক্ষম হয়ে আসলো। তখন স্বামী উঠে আবার তাকে কষে একচোট জুতা পেটা করলো। মোটকথা সকাল পর্যন্ত অন্ধ ওস্তাদ দ্বারা খুব যাতা পিষালো এবং জুতা দিয়েও কম কষালো না। অন্ধ ওস্তাদের শাস্তি পূর্ণ মাত্রায় হয়ে গেলে তখন স্বামী স্থান ত্যাগ করে উঠে চলে যায়। স্ত্রী তখন এসে চুপি চুপি দেরী না করে এই সুযোগ ওস্তাদকে চলে যেতে বলে। অন্ধ সাহেব দ্রুত সেখান থেকে পালালো এবং তার বাসায় গিয়ে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। অন্ধের শাস্তিতো বেশ হয়েছে। কিন্তু মহিলাও কম ধুরন্দর নয়। আর একদিন সে তার ছেলের মাধ্যমে ছালাম জানিয়ে আবার ওস্তাদকে ডেকে পাঠালেন। দূরভিসন্ধি বুঝতে পেরে ওস্তাদ বললো, “বুঝেছি ঘরে মনে হয় আটা নেই। তাই এই পোড়া কপালের ডাক পড়েছে।”

অনুবাদঃ ম.আ. মাহদী